Department of History

Semester –VI (General)

Course Code – 504

Course Type – SEC-2

Name of the Project: "1857 সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি"

Submitted by

Name: ……………………………………………………………….

Roll ……………………………………… No. …………………….

Registration No …………………………………………………….

Acknowledgement (কৃতজ্ঞতাস্বীকার)

Project-টি তৈরী করতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও নিরন্তর উৎসাহদানের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের বিভাগীয় প্রধান শ্রী বিজন সরকার মহাশয়ের নিরন্তর সাহায্য ও আন্তরিক অনুপ্রেরনা আমাকে সাহায্য করেছে কাজটি সম্পন্ন করতে। আমাদের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাননীয় শ্রী আবেশ চ্যাটার্জী মহাশয় ও বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক মাননীয় শ্রী রাজকুমার মণ্ডল মহাশয় - প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন এই কাজটি সম্পন্ন করতে। এনারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বিষয়ের সার্বিক ও অনান্য দিকগুলিও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয়ের সার্বিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কলেজের অনান্য বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এই কাজটি সম্পন্ন করতে। কলেজের সমস্ত শিক্ষয়াকর্মীরাও যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন কাজটি সম্পূর্ণ করতে। তবে যে কথা উল্লেখ না করলে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ন থাকতো তাহলো গ্রন্থাগারের কথা। গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয় একাজে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যাবলী সরবরাহ করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানে যদি কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে তার দায় ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ আমার।

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা দেখেছি যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে সমসাময়িক ইংরেজ আমলা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রথমে মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন মতামতগুলি আলোচনা করে বিদ্রোহের ধারার ওপর আলোকপাত করলে বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়বে। বিতর্কের সূত্রপাত ১৮৫৮ সালে। জে. বি. নর্টন (J. B. Norton) তাঁর Topics for Indian Statesman-এ প্রথম লিখেছিলেন—এটি একটি সামান্য সিপাহি বিদ্রোহ ছিল না; এই অভ্যুত্থান একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু আর এক সমসাময়িক ইংরেজ চার্লস রেইকস (Charles Raikes) তাঁর Notes on the Revolt in North Western Province of India-তে বলেছিলেন-এটা ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ। ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শিথিল হবার ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডাফ, কায়ে, বল, ম্যালেসন অবশ্য নর্টনের বক্তব্যের সমর্থক এবং তাঁরা সকলেই ১৮৫৭ সালের এই বিদ্রোহে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার একটি সংগঠিত প্রয়াস দেখতে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে বেশকিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন। আবার রেইন্স উত্থাপিত দ্বিতীয় মতটির সমর্থকও প্রচুর। ১৮৫৮ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন- "এই বিদ্রোহ ছিল অবশ্যই কেবলমাত্র সিপাহিদের অভ্যুত্থান। এক লক্ষ সিপাহি এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানে গণবিদ্রোহের ছিটেফোঁটাও ছিল না।" অন্য দুই সমসাময়িক ভারতীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির লেখাতেও একই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। গল্সে ভাটজি নামে জনৈক মারাঠা পর্যটক যিনি বিদ্রোহের সময় উত্তর ভারত ভ্রমণ করছিলেন তিনিও একই কথা বলেছেন। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই বিতর্ক চলেছে। পরবর্তীকালের প্রচুর ঐতিহাসিক তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্যার জন লরেন্স এবং সিলি এই বিদ্রোহকে "দেশদ্রোহী ও স্বার্থপর" (unpatriotic and selfish) সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে এই বিদ্রোহের পেছনে কোনো সংগঠিত নেতৃত্ব বা জনসমর্থন ছিল না। এল. ই. আর. রিস্ (L. E. R. Reese) এই বিদ্রোহকে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের খ্রিস্টধর্ম-বিরোধী জেহাদ হিসাবে দেখেছেন। ইংরেজ লেখক টি. আর. হোমসের মতে- এই বিদ্রোহে সভ্যতা বনাম বর্বরতার সংঘাত প্রকাশ পেয়েছিল।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার জোরের সঙ্গে বলেছেন এটি ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ মাত্র। এই অভ্যুত্থানকে কোনোমতেই জাতীয় যুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে না। তাঁর মতে-একদল সিপাহি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ভারতীয় জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মানুষ এই বিদ্রোহে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেছেন-ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার তখন "ভূণাবস্থা"। সুতরাং সেখানে কোনো জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম গড়ে উঠেতে পারে না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনও এই বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে মেনে নিতে নারাজ। তিনি বলেছেন-সিপাহিদের অভ্যুত্থানের সুযোগে একদল হতাশ সামন্তপ্রভু নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাঁর মতে বিদ্রোহের পেছনে কোনো জাতীয় নেতৃত্বের বা জাতীয় স্তরে কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল না এবং অভ্যুত্থানগুলি হয়েছিল বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অনেকেই কিন্তু এই মহাবিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে সিপাহিরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়েই ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল। বীর সাভারকারও ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একটি জাতীয় যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে বিতর্কের উপর সম্পূর্ণ নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী। তিনি তাঁর Civil Rebellion in the Indian Mutinies গ্রন্থে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুদ্ধ বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এটিকে একটি গণবিদ্রোহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ সাল জুড়ে সিপাহিদের বিদ্রোহ ছাড়াও ভারতেরবিভিন্ন প্রান্তে যে অসামরিক সাধারণ মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই সংগ্রামের নেতারা "জাতীয়তাবাদের অচেতন যন্ত্র" (unconscious tool of Nationalism) হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স অবশ্য এই বিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একদল গ্রামীণ ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুরাগীরা তাঁদের অনুসরণ করেছিল মাত্র। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এই বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়নি। আর একজন কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক সি. এ. বেইলি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন-বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকেই অসামরিক মানুষের বিদ্রোহ এবং সিপাহিদের অভ্যুত্থান একে অপরকে শক্তিশালী করেছিল (....... from its inception the civilion rebellion and the mutinies reinforced each other.)। কারিগর, বিক্ষুব্ধ পুলিশ,

দিনমজুর প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা শহুরে জনতা যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল-একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বেইলি আবার অন্যত্র বলেছেন- "বিদ্রোহীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ মতাদর্শ বা কর্মসূচি ছিল না। প্রথম থেকেই পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের খুব বেশি প্রাধান্য ছিল। বিদ্রোহের ভিত্তি কোনোমতেই জাতীয়তাবাদ ছিল না কারণ প্রান্তিক অথবা অবক্ষয়গ্রস্ত এলাকাগুলি থেকেই দীর্ঘ প্রতিরোধ উঠে এসেছিল" (Ultimately no coherent ideology or programme existed to channelise the aspirations of the rebels There were too many representatives of the old order involved from the start. Nor did nationalism provide a basis since it was from the marginal or declining areas of Indian society the most prolonged resistance generally came.)।

এই মহাবিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িককালে কার্ল মার্কস্ New York Daily Tribune পত্রিকায় এই অভ্যুত্থান সম্পর্কিত প্রবন্ধে এটিকে "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে মার্কস্বাদী পণ্ডিত রজনী পাম দত্তের লেখায় রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও এরিক স্টোক্সের বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও এই বিদ্রোহকে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সামন্তপ্রভুদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে শেষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিশেষত তলমিজ খালদুন, সুপ্রকাশরায় এবং প্রমোদ সেনগুপ্ত এই মহাবিদ্রোহকে ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গৌরবময় সংগ্রামের কাহিনী হিসাবে দেখেছেন। তলমিজ খালদুন এই বিদ্রোহকে "দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষক যুদ্ধ" (.. a peasant

war against indigenous landlordism and foreign imperialism) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর ভারতীয় মহাবিদ্রোহ গ্রন্থে বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যুত্থানের গতিপ্রকৃতি তথ্য সহকারে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বিহার সর্বত্রই এই বিদ্রোহ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। তিন আরও দেখিয়েছেন যে বেশকিছু অঞ্চলের বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলার জন্য গেরিলা যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং বিদ্রোহীদের উত্থানের পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না-রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন বা বেইলির এই বক্তব্য অভ্রান্ত নয়। প্রমোদ সেনগুপ্ত এই বিদ্রোহে জঙ্গি কৃষক-বিদ্রোহের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন এবং বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক স্তম্ভসমূহ জমিদার, মহাজন, বানিয়া প্রভৃতিরাও বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। সুপ্রকাশ রায়ও বলেছেন-সিপাহিরা যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁদের আত্মীয়স্বজন যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন বা

পেশাচ্যুত হয়েছিলেন তাঁরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় বেশকিছু ক্ষমতাচ্যুত সামন্তপ্রভু বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলান।সুতরাং দুটি

প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিতর্ক উঠে এসেছে। এক, এই অভ্যুত্থানকে কি জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় এবং দুই, এই অভ্যুত্থান কি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল? বিদ্রোহের ধারা আলোচনা করলে এই মহাবিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

আম্বালা ও মিরাটে সিপাহিদের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটার পরই বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল দিল্লি দখল করা। ১৮৫৭ সালের ১১ মে বিদ্রোহীদের দ্বারা দিল্লি দখল ভারতের গণবিদ্রোহের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত। কারণ দিল্লি কেবল ভারতের পূর্বতন রাজধানী ছিল না, এটি ছিল সম্পদ ও সামরিক সরঞ্জামে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। জনৈক সমসাময়িক ইংরেজ জেলাশাসক মার্ক থর্নহিলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- "দিল্লির বাদশাহকে যখন পুনরায় সিংহাসনে বসানোর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন গ্রামবাসীরা মনে করেছিলেন আমাদের রাজত্বের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বানিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ; তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠিত করে তাদের হিসাবের খাতা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"সিপাহিদের বিদ্রোহের প্রায় পরে পরেই গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল। এস. সি. গুপ্ত বলেছেন-উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্রোহী মানুষদের উদ্দেশ্য ছিল যে জমিগুলি ব্রিটিশ আদালতগুলির কৌশলে তাঁদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা এবং জমি হস্তান্তরের ফলে যারা লাভবান হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

১৪ মে মুজাফফরনগরে সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল এবং এর আগে এই অঞ্চলে সিপাহিদের কোনো বিদ্রোহ হয়নি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, যিনি কখনোই এই অভ্যুত্থানকে গণবিদ্রোহ বলে স্বীকার করেননি, তিনি পর্যন্ত এই তথ্যের সত্যতা মেনে নিয়েছেন এবং এই ঘটনাকে একটি 'ব্যতিক্রম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহাজন ও বেনিয়াদের অর্থলিপ্সা ও উৎপীড়নের শিকার সাধারণ মানুষ এই অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। তারা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতগুলি এবং কালেক্টরেট অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল সাহারানপুর, আলিগড় ও মথুরা অঞ্চলে। সাহারানপুরেও সিপাহিদের বিদ্রোহের আগেই সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করেছিল। মুজাফফরনগরে খৈরাতি খান নামে জনৈক বৃদ্ধ পিন্ডারি এবং ক্ষমতাচ্যুত ভূস্বামী ১৮৫৭ সালের আগস্ট মাসে জাঠদের অভ্যুত্থানে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। বুলন্দশহর জেলার শিকারপুর অঞ্চলে মালাগড়ের এক পতিত অভিজাত নবাব ওয়ালিদাদ খান সৈয়দ ভূস্বামীদের নেতৃত্ব দেন। তিনি বৈবাহিক সূত্রে দিল্লির বাদশাহ্ বংশের আত্মীয় ছিলেন। একথা বলা হয়েছে- ওয়ালিদাদের মতো যোগ্য আর কিছু নেতা যদি ঐ সময়ে ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহে অংশ নিতেন তবে ইংরেজরা এত শীঘ্র এই বিদ্রোহ দমন করতে পারত না।

আগ্রার গুপ্তচর বিভাগের প্রধান উইলিয়াম মুইর (William Muir) ১৮৫৭সালের ২৫ আগস্ট লিখিত এক চিঠিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইলসনকে জানিয়েছিলেন-শুধু বিদ্রোহী সিপাহিরা নয়, জনসাধারণও

সাধারণভাবে আমাদের বিরোধী হয়ে উঠেছে; এই বিক্ষুব্ধ মানুষেরা দিনের পর দিন আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে এবং এটা অভ্যুত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ১৮৫৭ সালের ২১ মে বুলন্দশহর জেলার মানকপুর গ্রামের গ্রামপ্রধান উমরাও সিং গুর্জরদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গুর্জরেরা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং জেল ভেঙে গুর্জর বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। ঠিক তখনই আলিগড়ের বিদ্রোহী সিপাহিরা বুলন্দশহরে এসে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ রাজস্বব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গুর্জরেরা আলিগড় থেকে আসা সিপাহিদের সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজ-বিরোধী অভিযান চালিয়ে যায় এবং দাদ্রি, ডানকৌর, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি পরগনাগুলিতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। উমরাও সিং নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন এবং নতুন হারে কর বসান। ২৯ মের মধ্যে গোটা বুলন্দশহর জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন অন্তর্হিত হয়েছিল। বুলন্দশহর জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট রবার্টসন বিদ্রোহ দমন করার জন্য ২০ জুন তাঁর অভিযান শুরু করেন।

তৎক্ষণাৎ জেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। রবার্টসন তাঁর প্রতিবেদনে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- সিপাহিরা বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের মানসিকতায় এত দ্রুত পরিবর্তন কী করে এল, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না (Troops might mutiny, but I could hardly realize this rapid change among peaceful villagers.)। রবার্টসন একথাও স্বীকার করেছিলেন কেবল লুণ্ঠনবৃত্তির জন্য নয়, তারা ইংরেজ শাসনের মদতপুষ্ট 'বেনিয়া কা রাজ'-এর উচ্ছেদকল্পে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বেনিয়ারা ব্রিটিশ আদালতের সাহায্যে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষক ও ছোটো জমির মালিকদের জমি আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। তারই প্রতিবাদে হিন্দু ও মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও নথিপত্রে অগ্নিসংযোগ করেছিল।

বেরিলি অঞ্চলের সিপাহি বিদ্রোহ (৩১ মে) সেখানে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায় এবং তারপরই সেখানে গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। খান বাহাদুর খান নামে জনৈক রোহিলা নেতা নিজেকে ভারত-সম্রাটের সহকারী বলে ঘোষণা করেন এবং এই অঞ্চলে নিজের শাসন কায়েম করেন। যাবতীয় উচ্চপদে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায় করেছিলেন। ম্যালেসন লিখেছেন- অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশগুলির অধিকাংশ মানুষই ব্রিটিশ-বিরোধী উত্থানে অংশ নিয়েছিল। শাহজাহানপুরের সিপাহি ও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশ চৌকি ও সরকারি নথিপত্র ধ্বংস করেছিল। ক্যারু কোম্পানির মদ কারখানা অগ্নিদগ্ধ হয়। অধ্যাপক শশীভূষণ

চৌধুরী দেখিয়েছেন-উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষ যখন ব্রিটিশরাজের যাবতীয় চিহ্ন মুছে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছিল, তখন জমিচ্যুত তালুকদারেরা সেই সুযোগে, যারা নিলামে জমি কিনে জমির মালিক হয়ে বসেছিল, সেইসব বেনিয়াদের কাছ থেকে তাদের হৃত-জমি পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, বান্দা

প্রভৃতি এলাকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মহাজন, বেনিয়া ও পুলিশ থানা; আর শহরাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের বাংলো এবং সরকারি নথিপত্র ছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।একথা প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েছেন যে অযোধ্যার গণবিদ্রোহ একটি সার্বিক রূপ নিয়েছিল। অযোধ্যার বিদ্রোহে বেগম হজরত মহল তাঁর নাবালক পুত্রনবাব বির্জিস কাদেরকে সামনে রেখে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে অযোধ্যার বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন সরকার গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোরখপুরের মহম্মদ হাসান, সুলতানপুরের মেহেন্দি হাসান, শংকরপুরের বেণীমাধো, বীরবাহুর উদিতনারায়ণ ও মধুপ্রসাদ, ধুরুয়ার দেবী বক্স সিং প্রমুখ। ১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কোম্পানি সরকার "ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ" বা Narrative of Events নামে একটি দলিল প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছিল-"বিদ্রোহ একটি জনপ্রিয় চরিত্র গ্রহণ করার ফলে এবং কারা অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তা চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলে, যে গ্রামগুলির মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেটরা সে গ্রামগুলিকে সামগ্রিকভাবে পুড়িয়ে ফেলতে বা ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিল" (In consequence of the general nature of the rebellion and the impossibility of identifying the majority of the rebels, magistrates recommended the wholesale burning and destruction of all villages proved to have been sent men to take active part of the revolt.)। হোম্স স্বীকার করেছিলেন-অযোধ্যাতে ১,৫০,০০০ সশস্ত্র বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৩৫,০০০ সিপাহি ছিল।

বিহারে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুনওয়ার সিং নামে এক পতিত ও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার। তিনি জগদীশপুর অঞ্চলে প্রায় ২০,০০০ সৈন্যের ছয় মাসের ভরণপোষণের সামগ্রী মজুত রেখেছিলেন এবং নিজ-এলাকায় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিহারের গয়া জেলায় সাধারণ মানুষ হায়দর আলি খান এবং যুদ্ধর সিং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধর সিং নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সমস্ত গ্রামের জমিগুলি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। গয়ার সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়াজিরগঞ্জ অঞ্চলে কুশল সিং স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ৩০ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে রামগড়, লোহারদাগা এবং হাজারিবাগে সিপাহিদের উত্থান হয়েছিল। রাঁচি এবং ডোরান্ডা সিপাহিদের হস্তগত হয় এবং সিপাহিরা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে ও বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে গণবিদ্রোহ যুক্ত

হয়েছিল। এই অঞ্চলের বিদ্রোহ উপজাতি অভ্যুত্থান (tribal insurrection)-এর রূপ নিয়েছিল। সিংভূমের কোলেরা অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে তাদের নেতা ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত কোলেরা গৌরবময় সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। পালামৌ অঞ্চলের চেরো এবং খরিয়াররা দুই ভাই পিতাম্বর শাহি এবং নীলাম্বর শাহির নেতৃত্বে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকারবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল।

ওডিশার সম্বলপুরে সুরেন্দ্র সাই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগ্রাম ১৮৬২ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত চলেছিল। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল-"সুরেন্দ্র সাই সম্বলপুর অঞ্চলে একটি সমান্তরাল সরকার গড়ে তুলেছেন এবং সমগ্র এলাকা এক বিপজ্জনক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।" এক্ষেত্রেও রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন-"এই পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল" (The rebellion in these hilly regions was no doubt of a popular character.)।

বিদ্রোহের উত্তাপ পাঞ্জাবকে সেভাব স্পর্শ করতে পারেনি। সরকার এখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে এবং পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানিদের মধ্যে ঐতিহ্যগত শত্রুতাকে কাজে লাগিয়েছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবের গভর্নর হেনরি লরেন্স পাঞ্জাবের ভূমিরাজস্বের সাবেকি কাঠামোয় খুব একটা পরিবর্তন আনেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের বিভেদ ও শাসননীতিকে উপেক্ষা করে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা অঞ্চলের শিখেরা হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শতদ্রু নদীর দুই তীরে বিদ্রোহীরা বহু সংখ্যক ইংরেজ ও তাদের ভারতীয় সমর্থকদের হত্যা করেছিল। কার্নাল জেলার জাঠ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গণবিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অভ্যুত্থানকে সামান্য সিপাহি বিদ্রোহ হিসাবে দেখাতে চাইলেও উপরে বিবৃত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে যে এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। হনওয়ান্ত সিং নামে অযোধ্যার কলাকঙ্কর অঞ্চলের এক তালুকদার ইংরেজদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "সাহেব, তোমাদের দেশের মানুষ আমাদের দেশে এসে আমাদের রাজাকে বিতাড়িত করেছে। একটি আঘাতেই তোমরা আমার জমি নিয়ে নিয়েছ, যে জমি আমার পরিবারের পূর্বপুরুষেরা স্মরণকালের আগে থেকে ভোগ করে এসেছে। কিন্তু হঠাৎই তোমাদের ওপর চরম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। এদেশের মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এখন তোমরা আমার কাছে এসেছ, যার সবকিছু তোমরাই লুণ্ঠন করেছিলে। কিন্তু এখন? এখন আমি আমার অনুগামীদের নেতৃত্ব দিয়ে লক্ষ্ণৌ যাব তোমাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য।" হনওয়ান্ত সিং যে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরাও সে সত্য অনুধাবন করতে পারেননি যে সিপাহিরাও এদেশের মানুষ ছিল। দিল্লির পতনের পর ইংরেজরা যখন সমস্ত শক্তি দিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর ওপর মনঃসংযোগ করেছিল, তখন

অযোধ্যার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সশস্ত্র কৃষকেরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে হাজির হয়েছিল।

এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সি. বল (C. Ball) বলেছেন- "সমস্ত দেশের সশস্ত্র ভবঘুরের দল লক্ষ্ণৌ-এর দিকে ধেয়ে গিয়েছিল এবং ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে শেষ মহাসংগ্রামে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রতীক্ষা করেছিল" (The whole country was swarming with armed vagabonds hastening to

Lucknow to meet their common doom and die in the last grand struggle with the Firangis.) I

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. ভারতের ইতিহাস (৩ নং খণ্ড) জীবন মুখোপাধ্যায়

২। রাজ থেকে স্বরাজ সমর কুমার মল্লিক

৩। ভারতবর্ষের ইতিহাস সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

৪।ভারতবর্ষের ইতিহাস সুতপা মুখোপাধ্যায়

৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়